সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে করণীয়

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আসন্ন। নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তাদের কর্মপরিকল্পনা (রোডম্যাপ) প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছে। কমিশন তাদের রোডম্যাপ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সংলাপ শুরু করেছে। আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও সংলাপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের মতামত গ্রহণের জন্য আমরা কমিশনকে সাধুবাদ জানাই।

নাগরিক সংগঠন 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন থেকে শুরু করে অদ্যাবধি অনুষ্ঠিত সকল ধরনের (জাতীয় ও স্থানীয়) নির্বাচনে সাধ্যানুযায়ী বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সুষ্ঠু নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনে জনমত গঠনই সংগঠনটির নির্বাচনকেন্দ্রিক কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য। এছাড়াও বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার সাধনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করাও আমাদের কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য। কার্যক্রমের চলমান ধারাকে 'সুজন' আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর।

সুজন মনে করে, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য করতে হলে নির্বাচনী বিধি-বিধানে সংস্কার-সহ নির্বাচন কমিশনের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ করণীয় রয়েছে। একইসঙ্গে করণীয় রয়েছে সরকার, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজসহ নির্বাচন সংশিষ্ট সকলের।

নির্বাচন কমিশনের করণীয়:

সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন মানেই সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। শুধু তাই নয়, নির্বাচন বলতে প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনও, যেখানে ভোটার অনেক প্রার্থীর মধ্য থেকে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে বেছে নেবে। কারণ 'নির্বাচন' মানেই 'চয়েস' বা বিকল্পের মধ্য থেকে বেছে নেওয়ার সুযোগ। তাই প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশনকে সকল প্রতিযোগীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগে নিতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে শুধুমাত্র নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে সকলের জন্য সম-সুযোগ নিশ্চিত করলেই চলবে না, তফসিল ঘোষণার আগেও তা নিশ্চিত করতে হবে। সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনের যা যা করণীয় সে সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

আইনি কাঠামো: সুষ্ঠু ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আইনি কাঠমোতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। যেমন: (১) 'না-ভোটে'র বিধানের পুনঃপ্রবর্তন; (২) মনোনয়নপত্র অনলাইনে দাখিলের বিধান, যাতে হলফনামার তথ্য অবিলম্বে প্রকাশ করা যায়; (৩) জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা ও আয়কর বিবরণী দাখিলের বিধান; এবং (৪) রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক সদস্যদের নাম ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও নিয়মিত আপডেট করার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 'না-ভোটে'র বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত ছিল, যদিও আইনটি সংসদে অনুমোদনের সময় তা বাদ দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, উচ্চ আদালতের নির্দেশে ভারতের নির্বাচনে 'না-ভোটে'র বিধান প্রচলিত হয়েছে। আমাদের মাঠ পর্যায়ের নির্বাচনী কর্মকর্তারাও এটি পুনঃপ্রবর্তনের পক্ষে সুপারিশ করেছেন বলে আমরা শুনেছি।

ভোটার তালিকা: ২০০৭ সালে সেনাবাহিনীর সহায়তায় তৈরি সর্বাধিক সঠিক ভোটার তালিকায় পুরুষের তুলনায় ১৪ লাখের বেশি নারী ভোটার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর কারণ হলো যে, বিদেশে কর্মরত প্রায় এক কোটি বাংলাদেশিদের প্রায় সবাই পুরুষ এবং যারা অধিকাংশই ভোটার নন। কিন্তু পরবর্তীতে ভোটার তালিকায় হালনাগাদ প্রক্রিয়ায় 'জেন্ডার-গ্যাপ' বা নারী-পুরুষের সংখ্যায় অসমতা দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৫-১৬ সালের হালনাগাদের তথ্যানুযায়ী, মোট ১৬ লাখ ৮ হাজার ১৭১ জন ভোটার ভোটার তালিকায় নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, যার মধ্যে নারী ভোটার সংখ্যা মাত্র ছয় লাখ ৮১ হাজার ৯৭২ জন, অর্থাৎ নারী-পুরুষের অনুপাত ৪২.৪০: ৫৭.৬০ এবং জেন্ডার-গ্যাপ ২৬ শতাংশ। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকা দিয়ে নির্বাচন হলে তা প্রশ্নবিদ্ধ হতে বাধ্য (*বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম*, ১৩ আগস্ট ২০১৭)।

সীমানা পুনর্নির্ধারণ: নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। কয়েকটি সুস্পষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে তা করা হয়, যার একটি হলো সংসদীয় আসনগুলোতে জনসংখ্যায় যতদূর সম্ভব সমতা আনা। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে যে ৮৭টি নির্বাচনী এলাকায় সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলোতে ভোটার সংখ্যায় অসমতা আরও বেড়েছে, যা দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড উভয়েরই লঙ্ঘন (*যুগান্তর*, ২১ মে, ২০১৩)। তাই সঠিকভাবে সীমানা পুনর্নির্ধারণের দিকে কমিশনের মনোযোগ দিতে হবে। প্রসঙ্গত, আমরা ঢাকা মহানগরের জন্য আসন সীমিত করার পক্ষে।

মনোনয়নের লক্ষ্যে তৃণমূল থেকে প্যানেল তৈরির বিধানের প্রয়োগ: নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে তৃণমূল পর্যায়ের দলীয় সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে প্রত্যেক সংসদীয় আসনের জন্য একটি প্যানেল তৈরি করার এবং সেটি থেকে কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ড মনোনয়ন দেওয়ার বিধান সংশোধিত আরপিও'তে অর্ন্তভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে নবম সংসদে আরপিও অনুমোদনের সময়ে বিধানটিতে পরিবর্তন আনা হয়। সংশোধিত বিধান অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ডের এখন আর তৃণমূলে তৈরি প্যানেল থেকে মনোনয়ন প্রদানের বাধ্যবাধকতা নেই, বোর্ডকে শুধু তা বিবেচনায় নিতে হবে। এতে একদিকে যেমন তৃণমূলের মতামত উপেক্ষিত হচ্ছে, অন্যদিকে মনোনয়ন বাণিজ্যও দিন দিন বেড়ে চলেছে। আমরা মনে করি, তৃণমূলের থেকে প্যানেল তৈরির এ আইনি বিধান পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে তা আরও কঠোরভাবে প্রয়োগ করা আবশ্যক।

হলফনামা যাচাই/বাছাই ও ছকে পরিবর্তন: মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিলকৃত হলফনামায় অনেক প্রার্থীই অসত্য তথ্য দেন বা তথ্য গোপন করেন, যে কারণে তাদের মনোনয়নপত্র এবং নির্বাচিত হলে, নির্বাচন বাতিল হবার কথা। তাই আমরা মনে করি যে, হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য কঠোরভাবে যাচাই-বাছাই করে অসমাপ্ত হলফনামা প্রদানকারী, তথ্য গোপনকারী ও ভুল তথ্য প্রদানকারীর প্রার্থিতা বাতিল কিংবা তাদের নির্বাচন বাতিল করা আবশ্যক। একাজটি করা হলে অনেক অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের নির্বাচনী অঙ্গন থেকে দূরে রাখা এবং আমাদের রাজনীতি বহুলাংশে কলুষমুক্ত করা সম্ভব হবে। এছাড়া হলফনামার ছকটিও অসম্পূর্ণ এবং এতে গুরুতর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন, বর্তমানে অনেকে আয়ের উৎসের বিস্তারিত বিবরণ দেন না। কারা প্রার্থীদের ওপর নির্ভরশীল সে তথ্যও হলফনামা থেকে পাওয়া যায় না। এছাড়া প্রার্থীর বয়স এবং তার বিদেশি নাগরিকত্ব সম্পর্কিত তথ্যও হলফনামায় অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। বিধি প্রণয়ের ক্ষমতা প্রয়োগ করে হলফনামায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কমিশন আনতে পারে। একইসঙ্গে কমিশনের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে কমিশন হলফনামা যাচাই-বাছাই করার উদ্যোগ নিতে পারে। আলতাফ হোসেন বনাম আবুল কাশেম মামলার (ডিএলআর ৪৫, ১৯৯৩) রায়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ বলেছেন, নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যা যা করণীয়, তার সবই করতে পারবে, এমনকি আইন ও বিধি-বিধানের সংযোজনও করতে পারবে। কিন্তু ক্ষমতা থাকার পরও কমিশন অনেকটাই নির্বিকার, ক্ষমতার যথার্থ প্রয়োগ করেনি। প্রসঙ্গত, একমাত্র ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে হলফনামা প্রদানের বিধান নেই, যা করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

নির্বাচনী সহিংসতা রোধ: ড. এটিএম শামসুল হুদার নেতৃত্বাধীন কমিশনের সময়ে নির্বাচনী সহিংসতা ছিল না বললেই চলে। উদাহরণস্বরূপ, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনো প্রাণহানি ঘটেনি। সেই কমিশনের সময়ে রাজনৈতিক দলগুলো এবং তাদের মনোনীত প্রার্থীরাও আইনকানুন মানা শুরু করেছিল। বিগত রকিবউদ্দীন কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনসমূহে ব্যাপক সহিংসতা ঘটে। তাই নতুন নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী সহিংসতা রোধে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। অতীতের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার দিকটিও নিশ্চিত করতে হবে। তাঁরা যেন ভীতিমুক্ত পরিবেশে নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে সে ব্যবস্থা কমিশনকে আগে থেকেই করতে হবে।

নির্বাচনে সেনা মোতায়েন: বাংলাদেশের সব জাতীয় নির্বাচনেই সেনাবাহিনী ভূমিকা রেখেছে। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে, যে নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছিল এবং আওয়ামী লীগ ভূমি-ধ্বস বিজয় অর্জন করেছিল, সেনাবাহিনী আইনগতভাবে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অংশ হিসেবে, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। তাই এবারও সেনাবাহিনী সে ভূমিকা পালনকে আমরা যৌক্তিক বলে মনে করি। এছাড়াও অতীতে আমরা দেখেছি যে, চরম দলীয়করণে দুষ্ট আমাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষপাতদুষ্ট আচরণও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথে বড় বাধা। অতীতের অনেক নিবাচনে আমরা তাদেরকে সিল মারতে, ব্যালট বাক্স ভর্তি করতে এবং বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের হয়রানি করতে দেখেছি। আরেকটি বাস্তবতা হলো যে, বার বার জনমত জরিপে দেখা গিয়েছে যে, সেনাবাহিনী জনআস্থার দিক থেকে সবার ওপরে। উপরন্তু নির্বাচনী কর্মকর্তারাও, যারা নির্বাচন পরিচালনা করবেন, সেনাবাহিনীকে নির্বাচনের সময়ে মাঠে রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন। গত ৩১ জুলাই ২০১৭ তরিখে অনুষ্ঠিত বিশিষ্ট নাগরিকদের সাথে নির্বাচন কমিশনের বৈঠকেও বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। তাই ২০০৮ সালের মত আগামী নির্বাচনেও আমরা প্রতি নির্বাচন কেন্দ্রে সেনাবাহিনী মোতায়েনের পক্ষে। একইসঙ্গে কমিশনের পক্ষ থেকে একটি 'সিকিউরিটি প্ল্যান' বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন আবশ্যক বলে আমরা মনে করি।

দলের কমিটিতে নারী প্রতিনিধিত্ব: রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সকল পর্যায়ের কমিটিতে ২০২০ সালের মধ্যে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব রাখারও বিধান রয়েছে। আমাদের মনে হয়, রাজনৈতিক দলগুলো এক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। তাই এব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের নজরদারি প্রয়োজন। পাশাপাশি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক নির্দিষ্ট অনুপাতে নারী প্রার্থী মনোনয়নের জন্য বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন বলেও আমরা মনে করি।

নির্বাচনী ব্যয়সীমা: নির্বাচনী ব্যয়ের বৈধ সীমা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বিগত কমিশন এ ব্যয়সীমা ১৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা করেছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার থাকলেও তারা প্রতিনিধি হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আর আমাদের জাতীয় সংসদ পরিণত হয়েছে কোটিপতিদের ক্লাবে। বস্তুত আমাদের বর্তমান ব্যবস্থা হয়ে পড়েছে 'বেস্ট ডেমোক্রেসি মানি ক্যান বাই'। তাই কমিশনকে নির্বাচনী ব্যয়ের লাগাম টেনে ধরতে হবে এবং একইসঙ্গে নির্বাচনী ব্যয়ের বৈধ সীমা কমাতে হবে। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রার্থীদের পোস্টার ছাপানো ও প্রচার, হলফনামায় প্রদত্ত প্রার্থীদের তথ্যসমূহ ভোটারদের মধ্যে সরবরাহ এবং সকল প্রার্থীকে এক মঞ্চে এনে 'প্রজেকশন মিটিং' আয়োজনের মধ্য দিয়েও নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

নির্বাচনী বিরোধ: সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে হলে নির্বাচনী বিরোধের দ্রুত মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে নির্বাচনী বিরোধ সংক্রান্ত মামলাগুলো নিষ্পত্তির ব্যাপারে ব্যাপক দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচনী মামলা সংসদের মেয়াদ শেষ হবার আগেও নিষ্পত্তি হয় না। এধরনের দীর্ঘসূত্রিতা নির্বাচনী অপরাধকেই উৎসাহিত করে। নির্বাচনী বিরোধের দ্রুত মীমাংসার লক্ষ্যে শুধুমাত্র নির্বাচনী বিরোধ মীমাংসার জন্য একটি বিশেষ নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও একটি আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। প্রসঙ্গত, অতীতে নির্বাচন কমিশনকে বলতে শোনা গিয়েছে যে, নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পর কমিশনের আর কিছুই করার থাকে না, যা সঠিক নয়। নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনী ফলাফল বাতিলের ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের উচ্চ আদালতের অনেকগুলো সুস্পষ্ট রায় রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, *নূর হোসেন বনাম মো. নজরুল ইসলাম* মামলার [৪৫বিএলসি (এডি)(২০০০)] রায়ে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট রায় দে: 'আমরা একথা পুনর্ব্যক্ত না করে পারি না যে, নির্বাচন চলাকালে গোলযোগের, ব্যালট পেপার কারচুপির (rigging) বা নির্বাচন সঠিক (just), সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়নি বলে রিপোর্ট বা

অভিযোগ উত্থাপিত হলে, উক্ত রিপোর্ট বা অভিযোগের সত্যতা যাচাইপূর্বক কমিশনের ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক।'

কমিশনে নিয়োগ আইন: নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন বিষয়ে একটি আইন প্রণয়ন অতি জরুরি, তাই কমিশনকে এব্যাপারে মনোযোগী হতে হবে। আমরা মনে করি, ভবিষ্যতে কমিশনে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিতর্ক এড়াতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সংবিধানের আলোকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের জন্য একটি যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরি।

রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন ও বৈদেশিক শাখা: আরপিও'র ৯০(গ) ধারা অনুযায়ী, নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের বিদেশি শাখা থাকা বেআইনি, যা রাজনৈতিক দলগুলো অমান্য করেই চলছে। এছাড়াও নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন বিলুপ্ত করার বিধান আরপিও'তে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার প্রতি রাজনৈতিক দলগুলো ভ্রুক্ষেপও করছে না, যদিও ঐতিহাসিকভাবে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন শিক্ষা প্রতিষ্ঠনগুলোতে তাণ্ডব সৃষ্টি করেই চলছে। আমরা মনে করি, এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে আইনকানুন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কঠোরতা প্রদর্শন করতে হবে।

সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন: আমরা মনে করি যে, সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন জরুরি, যাতে ভুয়া এবং অসত্য সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করা যায়। কারণ অসত্য সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে নির্বাচন প্রভাবিত হতে পারে।

কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা: একটি অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য কমিশনকে প্রথমেই সংশ্লিষ্ট সকলের আস্থা অর্জন করতে হবে এবং নিরলসভাবে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনার মধ্য দিয়ে এই আস্থা টিকিয়ে রাখতে হবে। উল্লেখ্য, সাংবিধানিকভাবে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোন কর্তৃপক্ষের কাছে সরাসরিভাবে কমিশনের জবাবদিহিতা করতে হয় না। তাই সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা চর্চার মাধ্যমেই কমিশনকে জনগণের আস্থা অর্জন এবং তাদের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, একটি অস্বচ্ছ ও প্রশ্নবিদ্ধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুনর্গঠিত হবার কারণে কমিশনের সম্পর্কে কারো কারো দৃষ্টিতে একটি আস্থার সংকট ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে, যা কমিশনের মাননীয় সদস্যদেরকে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্মরণে রাখতে হবে। এছাড়া মাননীয় সিইসি ও সচিব মিলে, অন্যান্য কমিশনারদের সম্মতি ব্যতিরেকে, সাম্প্রতিককালে কমিশনের কর্মকর্তাদের বদলির বিষয়টি নিয়েও কমিশন সম্পর্কে জনমনে নতুন করে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। প্রসঙ্গত, নির্বাচন কমিশন একটি যৌথ সত্ত্বা এবং সিইসি অন্য কমিশনারদের সম্মতি ব্যতীত কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এককভাবে নিতে পারেন না *[জাতীয় পার্টি বনাম নির্বাচন কমিশন*, ৫৩ ডিএলআর (এডি) (২০০১)]। সুতরাং, এই সময়ে কমিশনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে একটি হলো নাগরিকদের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা।

সরকারের করণীয়:

সবচেয়ে নিরপেক্ষ, শক্তিশালী ও সাহসী নির্বাচন কমিশনের পক্ষেও সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়, যদি প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তথা সরকার নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল আচরণ না করে। বস্তুত একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পূর্বশর্ত বা 'নেসেসারি কন্ডিশন', কিন্তু যথেষ্ট বা 'সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন' নয়। অর্থাৎ নির্বাচনকালীন সরকারের সদাচারণ ছাড়া গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। তাই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার স্বার্থে নির্বাচন কমিশনকে, সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সরকারের সহায়তা ও সদাচারণ নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই সবার জন্যই একটি সমতল ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে এবং কমিশনকে দলগুলোর মধ্যস্ততা করতে হবে না, যা কমিশনের দায়িত্বও নয়। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সমতল ক্ষেত্র প্রস্তুত হলে সকলে স্বপ্রণোদিত হয়েই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে এবং একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন নিশ্চিত হবে। এছাড়াও সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-সহ ভোটাররা যাতে অবাধে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে, সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

রাজনৈতিক দলের করণীয়:

সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পেতে হলে নির্বাচন কমিশনের সহযোগী হয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে শুরু থেকেই রাজনৈতিক দলের সক্রিয়তা প্রয়োজন। এর প্রথম ধাপ হলো রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থী নির্বাচন। দলের প্রার্থী নির্বাচনের ধরা-বাঁধা নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি বিভিন্ন দেশের আইন ও সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও, এটি নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাজনৈতিক দলের। সিংহভাগ দেশে এ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া প্রতিটি দলের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ বিষয় বলেই স্বীকৃত। তবে এক্ষত্রে স্বীকৃত দুটি পদ্ধতি হচ্ছে– এক. দলের তৃণমূলে তৈরি তালিকা থেকে শীর্ষস্থানীয় মনোনয়ন বোর্ডের মাধ্যমে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় মনোনয়ন নিশ্চিত করা; দুই. তৃণমূল পর্যায়ে গোপন ভোটের মাধ্যমে প্যানেল তৈরি করা। প্রসঙ্গত, প্রথম প্রক্রিয়াটি পুরোপুরিভাবে গ্রহণ না করার কারণে নির্বাচনে তথাকথিত 'বিদ্রোহী প্রার্থী'র জন্ম দেয়, যার উদাহরণ আমরা আমাদের দেশে বিগত নির্বাচনসমূহে দেখতে পাই। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর অবশ্য একটি স্বীকৃত ধারায় প্রার্থী নির্বাচন করা উচিত, তা না হলে নতুন রাজনীতিবিদদের যেমন উত্থান হবে না, তেমনি মেধাবী তরুণদের রাজনীতিতে আকৃষ্ট করা যাবে না।

রাজনৈতিক দল ও তাদের মনোনীত প্রার্থীদের ওপরই বহুলাংশে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নির্ভর করে। কারণ রাজনৈতিক দল ও তাদের মনোনীত প্রার্থীরাই প্রায় সকল নির্বাচনী অপরাধের উৎস। তারাই মনোনয়ন বাণিজ্যে লিপ্ত হয়, নির্বাচনে টাকা দিয়ে ভোট কেনে, নির্বাচনে পেশি শক্তির ব্যবহার করে, প্রতিপক্ষকে হুমকি দেয়, ভোটারদেরকে ভোটকেন্দ্রে আসতে বিরত করে এবং ভোটকেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ইত্যাদি ইত্যাদি। রাজনৈতিক দলগুলোই নির্বাচনকে টাকার খেলায় পরিণত করে, যা আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য আজ বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই

রাজনৈতিক দলগুলোর এবং তাদের প্রার্থীদের সদাচারণ ব্যতীত সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রায় অসম্ভব। বস্তুত দল ও প্রার্থীর সদাচারণ নিশ্চিত হলে নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথের অনেক বাধাই দূর হয়ে যাবে। আর এজন্য প্রয়োজন হবে রাজনৈতিক দলের সদিচ্ছা, দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা ও শুদ্ধি অভিযান।

রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনকে একটি প্রতিযোগিতা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে। শুধু তাই নয়, যে কোনো মূল্যে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার মনোভাব পরিত্যাগ করতে হবে। নির্বাচনসংশ্লিষ্টদের দলীয় প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার জন্য কোনোভাবেই প্রভাবিত করা যাবে না। নির্বাচনী সকল নিয়ম-কানুন ও আচরণবিধি মেনে চলতে হবে। এলক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনকালীন সরকার সম্পর্কে একটি ঐকমত্য জরুরি।

গণমাধ্যমের করণীয়:

নির্বাচনে ভোটাররাই ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। তাই ভোটারদের সচেতনতা এবং তাদের প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্যপ্রাপ্তি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য। গণমাধ্যম এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। গণমাধ্যম প্রার্থীদের সম্পর্কে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ এবং প্রার্থী কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যসমূহ ভোটারদের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরতে পারে, যাতে ভোটাররা প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোট দিতে পারেন। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে হতে হবে মিডিয়াবান্ধব এবং মিডিয়ার সহযোগিতা কমিশনকে গ্রহণ করতে হবে। নির্বাচনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক তুলে ধরার জন্য নির্বাচন কেন্দ্রে গণমাধ্যমকে অবাধ বিচরণ করতে দেওয়া উচিৎ। নির্বাচনের দিন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের কেন্দ্রে প্রবেশ করার ওপর কড়াকড়ি আরোপ এবং ভোটের অগ্রগতি ও আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত অবস্থা স্বচ্ছভাবে তুলে ধরার প্রক্রিয়াকে সীমিত করা অনাকাঙ্খিত। বরং মিডিয়াকে নির্বাচন কমিশনের চোখ-কান হিসেবে গণ্য করা আবশ্যক। কারণ সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম।

নাগরিক সমাজের করণীয়:

অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সকলেই যেন স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে যথোপযুক্ত ভূমিকা পালন করেন, সে লক্ষ্যে নাগরিক সমাজ তথা সচেতন নাগরিকদের পাহারাদার (ওয়াচ ডগ) ও চাপ সৃষ্টিকারীর (প্রেসার গ্রুপ) ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। পাশাপাশি তাঁদেরকে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের পক্ষে এমনভাবে আওয়াজ তুলতে হবে, যাতে তাঁদের নির্বাচিত হয়ে আসার মত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিরপেক্ষভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

ভোটারদের করণীয়:

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোটারদেরও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ভোটারদের ভোট প্রদানকে গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক দায়িত্ব মনে করে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করতে হবে। অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে অথবা অন্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, যুদ্ধাপরাধী, নারী নির্যাতনকারী, মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী, ঋণখেলাপি, বিলখেলাপি, ধর্মব্যবসায়ী, ভূমিদস্যু, কালোটাকার মালিক, অর্থাৎ কোনো অসৎ, অযোগ্য ও গণবিরোধী ব্যক্তিকে ভোট দেয়া যাবে না। ভোটদানের পাশাপাশি ভোটের ফলাফল রক্ষার ব্যাপারেও তাঁদের সচেতন এবং প্রয়োজনে সংগঠিত ও সোচ্চার হতে হবে।

শেষকথা:

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে ব্যাপক তোড়জোড় শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো অনেক আগে থেকেই মাঠ গরম করা শুরু করেছে। নির্বাচন কমিশন ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে। কমিশন কর্তৃক আয়োজিত সংলাপগুলোতে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন মহল থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ আসছে। কিছুদিনের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথেও সংলাপ করবে কমিশন। সেখান থেকেও নিশ্চয়ই গঠনমূলক অনেক মতামত আসবে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত পরামর্শের আলোকে নির্বাচন কমিশন কিছু পথ নির্দেশনা পাবে, যা সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে করণীয় নির্ধারণে কমিশনকে সহায়তা করবে। তবে নির্বাচন কমিশন সুজন ও অন্যান্যদের যৌক্তিক প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করে আন্তরিকভাবে বাস্তবায়নে উদ্যোগী হলে, তা একাধারে যেমন সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও অর্থবহ নির্বাচন নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে; বাংলাদেশের নির্বাচনী সংস্কৃতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে এবং নির্বাচন কমিশনকে প্রকৃত অর্থেই একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে।

পরিশেষে একথা বলা আবশ্যক যে, বর্তমান সাংবিধানিক বিধান সুষ্ঠু ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথে একটি অন্তর্নিহিত বাধা। কেননা, বর্তমানে সংবিধানিক বিধান অনুযায়ী সংসদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্ববর্তী ৯০ দিনের মধ্যেই পরবর্তী মেয়াদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং তা বর্তমান সংসদ বহাল রেখেই। এই বিধান বহাল রেখেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে 'লেভেল প্লেইং ফিল্ড' বা সবার জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা দুরূহ হবে। আর সেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান হবে সুদূরপরাহত। অন্যভাবে বলতে গেলে, দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ বহাল রেখে নির্বাচন হলে ক্ষমতাসীনরা বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে। তাই অতীতে বাংলাদেশের ইতিহাসে যতগুলো নির্বাচন দলীয় সরকারের অধীনে হয়েছে, সেসবগুলোতেই ক্ষমতাসীনরা জয়ী হয়েছে। সাম্প্রতিককালে প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে দলীয়করণ আরও চরম আকার ধারণ করেছে। তাই আমাদের বিরাজমান সাংবিধানিক কাঠামোই সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের পথে একটি built-in barrier বা অন্তর্নিহিত প্রতিবন্ধকতা। এমতাবস্থায় এমনকি সবচেয়ে স্বাধীন, শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের পক্ষেও প্রতিযোগিতামূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান সহজ হবে না। তাই সংশ্লিষ্ট সকলকে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে।

প্রবন্ধটি ২২ আগস্ট ২০১৭, জাতীয় প্রেসক্লাবে 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে উত্থাপনের জন্য প্রস্তুতকৃত